পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সা:) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আ:)

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ইং : ১৪ই মহররম. ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ ইং | ৩৩শ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
০ হাদিস শরীফ : 'সফর ও মেলামেশার রীতি'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৭
০ অমৃতবাণী : 'সদাআগণের সাহচর্য'	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৮
০ জুমার খোৎবা		
০ সংবাদ : ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সালানা জলসা বাংলাদেশ আনসারুল্লার বার্ষিক ইজতেমা ওক্‌ফে জদীদের চাঁদা কাদিয়ান ও রাবওয়ায় সালানা জলসা পবিত্র হজ্ব-পালন	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	১১
০ কায়রো-বিতর্ক	হযরত আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ) অনুবাদ : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৭
০ দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মা'জুজ	জাফর আহমদ	

শুভ বিবাহ

বিগত ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৮ইং রোজ শুক্রবার জুমার নামাজান্তে নারায়ণগঞ্জ মসজিদে নাটোর শহর নিবাসী আহমদ হোসেন আফ্‌রাদ পিতা মঈনুদ্দিন আফ্‌বাদের বিবাহ নারায়ণগঞ্জ জামা'তের অন্তর্গত আকবরনগর গ্রামের অধিবাসী মুস্লিম খান সাহেবের ৩য় কন্যা মোসাম্মাৎ ছালেমা খাতুন এর সহিত সুসমপন্ন হইয়াছে। বিবাহ পড়াইয়াছেন নারায়ণগঞ্জ জামা'তের খতিব জনাব আনোয়ার আলী সাহেব। মোহরানা ২০০০.০০ (দুই হাজার টাকা মাত্র। ধার্য্য করা হইয়াছে। বিবাহের বাবরকৎ হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর খেদমতে দোয়ার আরজ করা যাইতেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ের ৩২ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ইং : ১৪ই মহররম, ১৩৫৭ হিজরী শামসী :

339 PI ERBUG
MIRPUR
DHAKA—1210
ZILLUR RAHMAN KHAN

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কাওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সুরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মোঃ মোহাম্মদ. আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কতক লোকের মনে সন্দেহ জাগিতে পারে যে, এখানে কওসার বলিতে সুন্নীগণের আকীদা অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রাঃ) অথবা শিয়াগণের আকীদা অনুযায়ী হযরত আলি (রাঃ)-কে বুঝাইয়াছে। মসীহ এবং মাহদীর উপরই কেন কওসার শব্দ প্রয়োগ করা হইতেছে? ইহার উত্তর—(১) আগমনকারীকে মহাদাতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই দুই নাম উক্ত বুযুরগানকে দেওয়া যাইতে পারে না। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যামানায় বিজয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও ধন আসে নাই। ধন আসিয়াছিল হযরত ওমর (রাঃ)-এর যামানায়। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জন্য মহাদাতা আখ্যা প্রযুক্ত হয় না। পক্ষান্তরে কেহ হযরত ওমর (রাঃ)-কে হযরত আবু বকর (রাঃ) অপেক্ষা বড় মনে করে না। সুতরাং তাঁহার মহাদাতা হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ)-কেও মহাদাতা আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ তাঁহার যামানায় আরও ধন আসার পরিবর্তে মুসলমানগণ যে ধন পাইয়াছিল, উহা হস্তচ্যুত হইতে লাগিল। তাঁহার খেলাফতকালে শাম ও মিশর বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এই দুই দেশ খুব ধনী এলাকা ছিল। এই দুই দেশ হইতে ধন আসিয়াছিল। এই দুই দেশ বাহির হইয়া যাওয়ায়, হেজাযের প্রয়োজন অতি কষ্টে নির্বাহ হইত। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ)-কেও মহাদাতা বলা যাইতে পারে না। ধন কেবল হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যামানায় আসিয়াছিল। সুন্নী বা শিয়াগণের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় বলে না। তাহা ছাড়া এই ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলি নির্দেশ করিতেছে যে এই ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামী জাহানে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর পরবর্তীকালের মধ্যে

সর্বাপেক্ষা বড় এক মহাপুরুষের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। সর্বসম্মতিক্রমে সেই মহাপুরুষ হইলেন মসীহ ও মাহদী। তাঁহারই যামানা সম্বন্ধে আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন "আমি বলিতে পারি না, তাঁহারই যুগের লোক বেশী ভাল না আমার যুগের লোক"। তিনি আরও বলিয়াছেন, "মাহদীর পিতার নাম, আমার পিতার নামের ন্যায় এবং তাঁহার মাতার নাম আমার মাতার নামের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ "তিনি আমার পূর্ণ অনুরূপ হইবেন" তিনি আরও বলিয়াছেন, মসীহ আমার কবরে দাফন হইবেন।" বাহ্যিকভাবে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কে এমন নির্লজ্জ দুঃসাহসী আছেন, যে অন্য কোন ব্যক্তিকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কবরে দাফন করিবার জন্য কোদাল হস্তে লইয়া তাঁহার কবর খুঁড়িতে খাড়া হইবে? তাহার উপর কি বজ্রপাত হইবে না? বস্তুত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কথাগুলি রূপক। ইহার অর্থ এই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্বা তাঁহা হইতে পৃথক নহে। আল্লাহ-তায়ালা তাঁহাকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সন্নিধ্যে স্থান দিবেন। পরিণামে উভয়ের স্বত্বা অভিন্ন হইবে। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ কোন কোন মুসলমান ইহার ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কবরকে [নাউযুবিল্লাহ] খোঁড়া হইবে এবং উহার মধ্যে মসীহকে দাফন করা হইবে।

উপরে যে রূপক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, উহা কুরআনের অনুরূপ। যথা—

والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم

অর্থাৎ যাহাদের সন্তানগণ পবিত্র হইবে, তাহাদিগকে তাহাদের পিতামাতার সঙ্গে মিলিত করা হইবে।" আঁ-হযরত (সাঃ) ও এই কথাই বলিয়াছেন যে, আগমনকারী তাঁহার রুহানী পুত্র হইবেন। এবং তাঁহাকে তাঁহার রুহানী মর্যাদার সন্নিধ্যে রাখা হইবে। সন্তানগণ সমমার্গের না হইলেও পিতামাতার নিকট থাকিলে, সুখ ও শান্তির কারণ হয়।

পবিত্র কুরআনে আগমনকারীর নামে طارق তারেক রাখা হইয়াছে। যিনি রাত্রের অন্ধকারে আসেন, তাঁহাকে 'তারেক' বলে। অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) গ্লানিপূর্ণ এক অন্ধকার যুগে আসিবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত আলি (রাঃ) আলোকের যুগে ছিলেন। সুতরাং কোন কথাই তাঁহাদিগের জন্য খাপ খায় না।

সুতরাং আলোচ্য ভবিষাদ্বাণীর শব্দগুলি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর ইসলামী জাহানে পরবর্তীকালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় এক মহাপুরুষের আগমনের দিকে নির্দেশ করিতেছে। এই জন্যই তাহার নাম কওসার রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি অপরাপর সকল আম্বিয়ার সেলসেলার উপর উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তাঁহার আগমনে আল্লাহতায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে কওসারীয়তের মর্যাদা দিবেন। তাঁহার উম্মত অপর সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। বস্তুতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অধীন হইয়া বাকী সকল নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অপর সকল উমতের উপর উম্মতে মোহাম্মদীয়ার

শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। এখনে ইহা পরিষ্কার করিয়া দিতে চাই যে, আঁ-হযরত (সাঃ) -এর মর্যাদা অদ্বিতীয় এবং তিনি সর্বাপেক্ষা বড় ছিলেন। বড় ব্যক্তির পুত্র বড় হইবে, ইহা সচরাচর ঘটে না। হযরত সুলেমান (আঃ) এক বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র অযোগ্য ছিল। সুতরাং সব সময়ে পুত্র পিতার ন্যায় বড় হয় না। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মত তখনই সর্বাপেক্ষা বড় সাব্যস্ত হইতে পারে, যখন তাহাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, যিনি তাঁহার উম্মত হইয়াও বাকী সকল নবী হইতে বড় হন। যখনই এইরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে, তখনই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মত সর্বাপেক্ষা বড় সাব্যস্ত হইয়া যাইবে।

মোট কথা উপরুক্ত বিশ্লেষণ মূলে দেখা যাইতেছে আলোচ্য আয়াতে এক ও অভিন্ন মহাপুরুষ মসীহ ও মাহদীর আগমণের ভবিষ্যদ্বানী করা যাইতেছে। অত্রআয়াতে আল্লাহ-তায়ালা আরও জানাইয়াছেন, হে মোহাম্মদ সাঃ! তোমাকে এক রুহানী পুত্র দান করিব, যাহার আবির্ভাবে তোমার উম্মত অপর সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। কারণ সেই পুত্র তোমার উম্মতের মধ্য হইতে হইবে এবং তোমার অধীন হইয়া পূর্ববর্তী সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তোমার উম্মত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে" এই সূক্ষ্ম তত্ব বুঝাইতে আঁ-হযরত বলিয়াছেন: لو كان موسى و عيسى حيين لما و سعهما الا اتباعي "যদি মুসা ও ঈসা (আঃ) জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও আমার এতায়াত করিতে বাধ্য হইতেন।"

বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারিত, "ইহা প্রমাণহীন একটা ফাঁকা দাবী। হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ) মারা গিয়াছেন। তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে, তাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এতায়াত করিতেন কিভাবে জানা যাইত? জীবিত ব্যক্তির সহিত মোকাবেলা হইতে পারে। কিন্তু মৃতের সহিত কি রূপে মোকাবেলা হইবে এবং কিভাবে দাবীর সত্যতা সাব্যস্ত হইবে? উপরুক্ত হাদীস পাঠ মাত্র স্বাভাবিক ভাবে পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগে ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ) এর উম্মতে এমন কোন মহাপুরুষের জন্ম হয়, যিনি নিজেকে তাঁহার গোলাম বলেন এবং হযরত মুসা এবং ঈসা (আঃ)-এর উপর তিনি স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেন। এরূপ ঘটিলে আঁ-হযরত (সঃ)-এর দাবী সাব্যস্ত হইয়া যাইবে যখন বাস্তবে দেখা যাইবে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতে এমন এক ব্যক্তি জন্মলাভ করিয়াছেন, যিনি হযরত মুসা ও ঈসা আঃ-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন এবং নিজেকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গোলাম বলেন, তখন ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইল যে, হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ) বাঁচিয়া থাকিলে, তাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এতায়াত করিতে বাধ্য হইতেন। আমাদের আকীদা অনুযায়ী উক্ত হাদীসকে সাব্যস্ত করিবার জন্য আল্লাহতায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ)-এর উপর নিজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়াছেন এবং নিজেকে আঁ-হযরত (সাঃ) এর গোলাম বলিয়াছেন।

সাধারণ মুসলমানগণ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করিয়া বলে, মির্যা সাহেব হযরত ঈসা (আঃ) -এর অবমাননা করিয়াছেন।

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

অর্থাৎ "ইবনে মরিয়মের কথা ছাড়, গোলাম আহমদ তাঁহার চেয়ে শ্রেয়।" বস্তুতঃ ইহা অপমান নহে, বরং উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, "যদি হযরত

মুসা ও ঈসা (আঃ) জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমার এতায়াত ছাড়া তাহাদিগের গত্যান্তর ছিল না।" তদনুযায়ী হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন :—

"ইবনে মরিয়মের কথা ছাড়, গোলাম আহমদ তাঁহার চেয়ে শ্রেয়।" অর্থাৎ "আমি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর গোলাম কিন্তু আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে শ্রেয়।" ফলে, যিনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন, তিনি যখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গোলাম তখন হযরত ঈসা (আঃ) বাঁচিয়া থাকিলে যে তিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এতায়াত করিতে বাধ্য হইতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি যখন হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া নিজেকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গোলাম বলেন, তখন হযরত মুসা (আঃ) বাঁচিয়া থাকিলে যে তিনিও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গোলাম হইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রত্যেকটি দাবী কুরআন এবং হাদীস দ্বারা সমর্থিত এবং তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁহার শুভসংবাদ আঁ-হযরত (সাঃ)-কে—انا اعطيناك الكوثر আয়াতে দেওয়া হইয়াছিল।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, اعطيناك "তোমাকে দিয়াছি" শব্দ অতীত কালে ব্যবহার হইয়াছে। এমতাবস্থায় অতীতের দান ভবিষ্যতে মির্যা সাহেবের জন্য কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য অতীত কাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন আমরা কাহাকেও কোন বস্তু নিশ্চয় দিবার ইচ্ছা রাখি তখন সে কখন পাইবে প্রশ্ন করিলে, আমরা বলি, মনে কর উহা পাইয়া গিয়াছ। বিভিন্ন ভাষায় ভবিষ্যতকালের জন্য ঈদৃশভাবে অতীতকালের সাধারণ ব্যবহার আছে তদনুযায়ী আল্লাহতায়ালা এখানে অতীতকালের ব্যবহার দ্বারা তাঁহার ভবিষ্যতদানের সুনিশ্চয়তার প্রত্যয় দিয়াছেন যেন তিনি ইহা দিয়া ফেলিয়াছেন। কেহ যদি ইহা মানিতে অস্বীকার করে এবং কওসার বলিতে জান্নাতের নহর অর্থকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহে, তাহা হইলে একই আপত্তি থাকিয়া যায় যে, আঁ-হযরত (সাঃ) কি জীবদ্দশায় জান্নাতের নহর লাভ করিয়াছিলেন? যদি কেহ বলেন যে আল্লাহতায়ালা ইহা তাঁহার মৃত্যুর পর পাওয়া জীবদ্দশাতেই নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের কথা নির্দিষ্ট করায় আপত্তি কোথায়?

অনুরূপভাবে কতক লোক কওসার বলিতে কুরআন করীমের বরকতসমূহ অর্থ করিয়াছে ইহাতে প্রশ্ন উঠে যে, যখন এই সুরা নাযেল হয়, তখন কি কুরআন করীমের বরকতসমূহ নাযেল হইয়া গিয়াছিল? বস্তুতঃ এই সুরা যখন নাযেল হয়, তখন সারা কুরআন মজিদেই নাযেল হয় নাই। সুতরাং উহার বরকতসমূহ তিনি কিভাবে পাইয়া গেলেন? ইহারও উত্তর একই যে, যেহেতু কুরআন মজিদের বরকতসমূহ লাভ তাঁহার জন্য নির্ধারিত ছিল, সেইজন্য এখানে অতীতকাল ব্যবহার হইয়াছে। সেইভাবে আমরা বলি যে اعطيناك শব্দ দ্বারা ইহা বলা হয় নাই যে সেই পুত্র তাঁহাকে তখনই দেওয়া হইয়াছিল, বরং যেহেতু তাঁহার ভবিষ্যত আগমন সুনিশ্চিত ছিল, সেইজন্য তাঁহার আগমনের খবর দিতে আল্লাহতায়ালা অতীতকালের ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে যদিও তাঁহার আগমন ভবিষ্যতে ঘটিবে তথাপি বিধিলিপিতে তিনি তাঁহাকে পূর্ব হইতেই দিয়া রাখিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৪০। সফর এবং তৎসম্পর্কিত নীত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৬৯। হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং বলিল: 'আস্সালামু আলাইকুম'। তিনি তাহার সালামের জবাব দিলেন। সে বসিবার পর তিনি ফরমাইলেন: "এই ব্যক্তি দশগুণ সাওয়াব পাইয়াছে।" অতঃপর আর একজন আসিল এবং বলিল, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" হুজুর (সাঃ) তাহার সালামের জবাব দিলেন। সে বসিলে পর তিনি ফরমাইলেন: 'সে বিশগুণ সওয়াব পাইয়াছে।' অতঃপর আর এক ব্যক্তি আসিল। সে বলিল: 'আসস্সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।' তিনি ঐ শব্দাবলীই সালামের উত্তরে বলিলেন। সে বসিবার পর ফরমাইলেন: 'এই ব্যক্তি ত্রিশ গুণ সওয়াব পাইয়াছে।'

('তিরমিযি, আবওয়াবুল ইস্তেজান বাবু ফি ফাযলিস্ সালাম; ২ : ৯৭ পৃঃ)

২৭০। হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে. আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন, "বৎস, যখন তুমি গৃহে যাও, তখন সালাম বলিবে। ইহাতে তুমিও বরকত প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার পরিবার-পরিজনও কল্যাণকৃত হইবে।"

('তিরমিযি, কিতাবুল ইস্তিযান, বাবু ফিৎ তাসলিমে ইযা দাখালা বাইতাহ, ২:৯৫ পৃঃ)

২৭১। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যখন তোমাদের কাহারো কোন ভ্রাতার সংগে সাক্ষাৎ হয়, তখন সালাম বলিবে। অতঃপর, যদি কোন গাছ, দেওয়াল বা প্রস্তর মাঝে বাধা জন্মায়, অর্থাৎ তাহারা এক জন অন্য জন হইতে অদৃশ্য হয় এবং পরক্ষণেই পরস্পর সাক্ষাৎ হয়, তবে পরস্পর সালাম করিবে।" [আবু দাউদ,' কেতাবুল্-আদব, ২ : ১০৬ পৃঃ]

২৭২। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আরোহী পদাতিককে এবং পদাতিক বসা ব্যক্তিকে এবং অল্প লোক অধিক লোককে সালাম করিবে (অর্থাৎ, প্রথম সালাম বলিবে)।"

['বুখারী', কেতাবুল ইস্তেযান, বাবু সালামের্ রাকেবে আলাল-মাযি; ২ : ৯২১ পৃঃ)

২৭৩। হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, যখন ইয়েমেনবাসীরা আসিল। তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হইয়া ফরমাইলেন: তোমাদের নিকট ইয়েমেনবাসীগণ আসিয়াছেন। ইহারাই পর্বপ্রথম মুসাফাহা (করমর্দন) প্রচলিত করিয়াছিল।" (আবু দাউদ, 'কিতাবুল আদব, বাবু ফিল্-মুসাফাহা; ২ : ১০৮ পৃঃ)

১৭৪। হযরত আসমা বিন্‌তে ইয়াযিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক দিন মসজিদের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। সেখানে এক দল মেয়ে লোক বসা ছিল। তিনি (সাঃ) হাতের ইশারা দ্বারা তাহাদিগকে সালাম করিলেন।" ('তিরমিযি,' কেতাবুল ইস্তিযান, বাবু ফিৎতাস্‌লিমে আলানেসা ; ২ : ৯৪ পৃঃ)

২৭৫। হযরত আনাস্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যখন ইহুদী ও নাসারা তোমাদিগকে সালাম করে, তখন তদুত্তরে "ওয়া আলাইকুম্" (অর্থাৎ, "তোমাদের উপর ও") বলিবে।"
('বুখারী, কেতাবুল ইস্তেযান, বাবু কাইফারুদ্দা আলা আহলে যিম্মাতেস্-সালাম পৃঃ ২ : ৯২৫)

২৭৬। হযরত উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-যযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক মজলিসের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। সেখানে মুসলমান, মুশরিক, পৌত্তলিক, ইহুদী সকলেই সম্মিলিতভাবে বসা ছিল। তিনি (সাঃ তাহাদিগকে 'আস--সালামু আলাইকুম' বলিলেন।" (বুখারী কেতাবুল ইস্তাযান, বাবুৎ-তসালমে ফি মজলিসিন ফিহে এখলাতম মিনাল মুসলেমিনা ওয়াল-মুশরেকীন ; ২ : ৯২৪ পৃঃ)

৪২। গৃহের ভিতর যাওয়ার অনুমতি গ্রহণের আদাব (নিয়মাবলী)

২৭৭। হযরত রাবিয়্ বিন্ হেরাশ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : বনি আমেরের এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, একদা তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিলেন, যখন তিনি (সাঃ) গৃহে ছিলেন : 'আমি আসিতে পারি কি? তিনি তাঁহার চাকরকে বলিলেন : 'যাও এবং তাহাকে বল যে, অনুমতি নেওয়ার নিয়ম এই যে প্রথমে বলিবে : 'আসসালামু আলাইকুম। তারপর বলিবে, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? যখন ঐ ব্যক্তি এই কথা শুনিল, তখন তাহাই করিল। প্রথম সালাম করিল। নিবেদন করিল : 'ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি কি? হুজুর (সাঃ) অনুমতি দান করিলেন। তারপর সে ভিতরে গেল।" ('আবু দাউদ 'কেতাবুল-আদব, বাবু ফিল-ইস্তিযান ; ২ ; ৭০৩ পৃঃ)

৪৩। মজলিসের আদব ও সাথীর হক

২৭৮। হযরত আবু-সায়িদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি শুনিলাম, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইতেছিলেন :

"সর্বোৎকৃষ্ট মজলিস উহা, যাহা প্রশস্ত ও বিস্তৃত এবং উহাতে লোক খুলিয়া বসিতে পারে।" ['আবু দাউদ, কেতাবুল্-আদব, বাবু ফি সায়াতিল্ মাজালিস ২ : ৬৬৩ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

সদাত্মাগণের সাহচর্য

"কুরআন শরীফে আসিয়াছে : قد افلح من زكيها অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করিয়াছে সে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ ও সফলতা লাভ করিবে।" তাযকিয়ায়ে-নফস বা আত্মশুদ্ধির জন্য সালেহ বান্দাগণের সংসর্গ এবং সৎব্যক্তিদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত উপকারী।" (মলফুজাত ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩)

'ইসলাহে-নফস" বা আত্মশুদ্ধির জন্য একটি পথ আল্লাহতায়ালা এই বলিয়াছেন যে, كونوا مع الصادقين অর্থাৎ, "যে সকল লোক কথায় ও কাজে এবং আত্মিক ও ব্যবহারিক সকল অবস্থায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের সহযোগে থাক।" ইহার পূর্বে বলিয়াছেন : يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله—অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর তকওয়া ধারণ কর।" এতদ্বারা এই বুঝায় যে সর্ব প্রথম ঈমান থাকিতে হইবে, অতঃপর সুন্নত অনুযায়ী গোনাহর ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে এবং সত্যবাদীগণের সংসর্গে থাকিবে। সাংসর্গের প্রভাব অনেক বেশী হইয়া থাকে, যাহা আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় অজ্ঞাতভাবে সংঘটিত হইতে থাকে "

(মলফুজাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪)

"যে তৃতীয় বিষয়টি কুরআন করীম হইতে প্রমাণিত, তাহা হইল সত্যপরায়ণগণের সংসর্গ লাভ। সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলেন : كونوا مع الصادقين—অর্থাৎ সত্যপরায়ণগণের সঙ্গে থাক। সাদেকীনের সংসর্গে এক বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। তাঁহাদের জ্যোতি, সততা ও সাধুতা এবং ধৈর্য-স্থৈর্য অন্যান্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মানুষের দুর্বলতা সমূহ দূরীকরণে সহায়ক হয়।" (মলফুজাত, ৭ম খণ্ড পৃঃ ২৬৯)

"নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতালাভের একটি বড় উপায় হইল সালেহ ও নেকবান্দাদের সংস্পর্শে থাকা। এই বিষয়ের দিকেই ইশারা করিয়া আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন : كونوا مع الصادقين—অর্থাৎ, তোমরা খোদাতায়ালার সৎ ও সত্যবাদী ব্যক্তিদের সংসর্গ লাভ কর, যাহাতে তাঁহাদের সাধুতার আলোকরশ্মী হইতে তোমরাও অংশ লাভ করিতে পার। যে সকল ধর্ম অনৈক্য ও পার্থক্য পছন্দ করে এবং পৃথক পৃথক থাকার শিক্ষা দান করে, সেগুলি নিশ্চয় সমষ্টিগত ঐক্যের কল্যাণ সমূহ হইতে বঞ্চিত থাকে। সেইজন্যই আল্লাহতায়ালা ছাড়িয়াছেন যাহাতে একজন নবী আসেন যিনি জামাত গঠন করেন এবং আখলাক বা চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয়, সহানুভূতি এবং একাত্মতা সৃষ্টি করেন।

(মলফুজাত ৭ম খণ্ড পৃঃ ১৩)

'দ্বীন তো চায় পারস্পরিক সাহচর্য স্থাপন। যদি কাহারও উক্ত সংসর্গে অনীহা ও বিমুখতা থাকে, তাহা হইলে সে দ্বীনদারী বা ধার্মিকতা অর্জনের কোন্ আশা রাখে? আমি তো বারবার বন্ধুগণকে উপদেশ দিয়াছি যে, তাঁহারা যেন বারবার এখানে (কেন্দ্রে) আসিতে থাকেন...এবং ফায়দা লাভ করেন। যে সকল লোক এখানে আমার নিকট আসিয়া বেশী বেশী থাকেন না এবং যে সকল কথা আল্লাহতায়ালা দৈনিক তাঁহার সেলসেলার সাহায্য ও সমর্থনে প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা শোনেন না এবং দেখেন না...আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহা বলিব যে, যথোপযুক্ত রূপে তাঁহারা ইহার মর্যাদা উপলব্ধি করেন নাই।" (আল হাকাম, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০ ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

রাবওয়া (মসজিদে আকসা), ১৩ই ইখা ১৩৫৭ হিঃ শাঃ (১৩ অক্টোবর ৭৮ইং)— তাশাহুদ ও তায়াউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকাদাস (আইঃ) পাঁচ মাস ইংলেণ্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত সাফল্যজনক ও বরকতময় তবলিগী ও তরবিয়তী সফর হইতে রাবওয়ায় প্রত্যাগমনের পর এই প্রথম জুমার নামাজের খোৎবায় আল্লাহতায়ালার শোকর আদায় করিয়া বলেন যে, আমার খেলাফত কালের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘ সময় মরকজ হইতে অনুপস্থিত থাকার পর আমি আজ আপনাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া এই খোৎবা প্রদান করিতেছি। অন্তর্বর্তীকালীন সফরের মধ্যে আল্লাহতায়ালা আমাদের উপর বড়ই ফজল নাজেল করিয়াছেন এবং এখানেও স্বীয় ফজল ও কৃপার ছায়াপাত করিয়াছেন যেজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি।

অতঃপর হুজুর তাঁহার এই তবলিগী ও তরবিয়তী সফরের শেষাংশে দাঁতের পীড়ার কারণে তাঁহার অসুস্থতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এখন আল্লাহতায়ালার ফজলে অনেকটা সুস্থ আছি। যে কষ্ট আসিয়াছিল তাহা আল্লাহর অনুগ্রহক্রমেই অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমি আপনাদের সকলের জন্য দোওয়া করিতে থাকি। আপনারাও দোওয়া করিবেন যেন আল্লাহতায়ালা আমাকে সুস্থ রাখেন ও কর্মক্ষম জীবন দান করেন। আমীন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, ইউরোপে আমার এই তবলিগী সফরের একাংশ ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত সেই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের সহিত সম্পর্ক রাখে যাহা হযরত মসীহ (আঃ) -এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিস্কৃতিলাভের বিষয়ের উপর ২রা, ৩রা ও ৪ঠা জুন ১৭৮ইং তারিখে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্স অনুষ্ঠানের পূর্বে ইংলেণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পত্র-পত্রিকায় উহার সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখা হয় বরং একজন সাংবাদিক ডেলী টেলিগ্রাফে, যাহা দশ লক্ষাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, পাঁচ স্তম্ভ পৃষ্ঠা ব্যাপী উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন। হুজুর বলেন কনফারেন্সের এই ব্যাপক প্রচারণা সেখানকার চার্চকে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করিয়া তোলে, যাহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হইল তাহাদের সেই প্রেস রিলিজ, যাহার মধ্যে তাহারা খোলাখুলিভাবে আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাহাদের আগ্রহ প্রকাশ করে. কিন্তু ইহার সহিত যে পত্র সংযুক্ত করা হয় উহাতে আলোচনার (কনফারেন্সের) প্রচার বন্ধ রাখার জন্যও বলা হয়। ইহার উত্তরে যে চিঠি আমরা দেই, প্রথমতঃ তাঁহারা উহার কোন উত্তর দান করেন না। তারপর, যখন আমরা পুনরায় স্মরণ করাই তখন দশ দিনের পরে অন্য কোন এক ব্যক্তির সাক্ষরে এই উত্তর আসিল যে, পূর্বে যিনি পত্র লিখিয়াছিলেন তিনি যেহেতু ইসলাম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, সেজন্য তিনি পরামর্শ করার পর আপনাদিগকে উত্তর দিবেন।

হুজুর বলেন যে, এই কনফারেন্স সম্বন্ধে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় বিপুল-ভাবে পর্যালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, যেজন্য বিশেষজ্ঞগণের বিবেচনায় দুনিয়ার চৌদ্দ কোটি মানুষের নিকট আমাদের আওয়াজ পৌঁছিয়া গিয়াছে।

ক্যাথালিক বিশপগণের প্রতিক্রিয়া এই হইয়াছে যে, তাঁহাদের অধিকাংশই আমাদের পত্রের উত্তরই দেন নাই। অবশ্য জাপানের বিশপ সাহেব স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যে, যেহেতু মসীহ (আঃ)-এর ঈশ্বরত্বে তাঁহাদের পাকা-পুক্ত বিশ্বাস রহিয়াছে সেইহেতু তাঁহারা উক্ত বিষয়ে আমাদের সহিত আলোচনা করিতে মোটেই প্রস্তুত নন। অথচ বুদ্ধি-বিবেক-বেবচনা তো বলে যে, যখন দুইটি পক্ষের পাকা-পুক্ত বিশ্বাস সমূহে বিরোধ ও পার্থক্য বিদ্যমান থাকে তখন সেই বিরোধ ও পার্থক্য প্রীতি ও ভালবাসার পরিবেশে ভাববিনিময় ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দূরীকরণের প্রয়াস পাওয়া উচিত।

হুজুর বলেন, এই কনফারেন্সের একটি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এই সংঘটিত হইয়াছে, যে, আমাদের আমেরিকার জামাতও দুই বৎসর পর অনুরূপ কনফারেন্স অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকার মেযাজ যেহেতু ইংল্যাণ্ড হইতে ভিন্নতর সেইহেতু আশা করা যায়, সেখানকার পত্র-পত্রিকা ইংলেণ্ডের প্রেসের তুলনায় উহার অধিকতর প্রচার করিবে এবং তাহারা চার্চের চাপ সৃষ্টি হইতে অনেকটা মুক্ত থাকিবে। ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষ হুজুর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া এ বিষয়ে আলোকপাত করেন যে, কিভাবে আল্লাহতায়ালা এই সফরের সকল পর্যায়ে অসাধারণরূপে তাঁহার সাহায্য ও সমর্থনের নিদর্শনাবলীর প্রদর্শন করিতে থাকেন। যে সকল খৃষ্টান আলেম পণ্ডিত বা সংবাদিক হুজুরের সঙ্গে দেখা করেন তাঁহারা নিরুত্তর হইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই ইসলামের সর্বাংগীণ সুন্দর শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলিয়া উঠিয়াছেন যে, এত সুন্দর শিক্ষা আপনি আমাদিগকে ইতিপূর্বে কেন জানান নাই।

হুজুর (আইঃ) বলেন, আমাদের নগন্য প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে এপর্যন্ত জগতময় পাঁচ লক্ষেরও অধিক খৃষ্টান খোদাতায়ালার ফজলে মুসলমান হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে জারী থাকা উচিত যখন খৃষ্টান জগত ইহা অনুভব ও উপলব্ধি করিবে যে, যাহাকিছু তাহাদের নিকট আছে আমরা তাহার চেয়ে উত্তম শিক্ষা পেশ করিতেছি, তখন তাহারা ইনশাআল্লা ইসলামের দিকে নিশ্চয়ই মনোযোগী হইবে। হুজুর বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যে সকল অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ, সাক্ষী-সবুত এবং নিদর্শনাবলী পেশ করিয়াছেন এবং কুরআন করীমের যে জ্ঞানতত্বপূর্ণ তফসীর করিয়াছেন সেগুলিকে পরিহার করিয়া উন্নত ইউরোপকে কখনও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে হুজুর বলেন, এই সফর আমার হৃদয়ে যে অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এই যে, আল্লাহতায়ালা আমাদের উপর বড়ই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যাস্ত করিয়াছেন আমাদিগকে বড়ই কঠিন অবস্থাবলীর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের আরাম-

প্রিয় জীবন যাপন পরিত্যাগ করা উচিত এবং আমাদের জিম্মাদারী সমূহ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে যতটুকুই আমাদের পক্ষে করা সম্ভব তাহা অবশ্যই করা উচিত, যাহাতে অবশিষ্ট অভাব বা শুন্যতা খোদাতায়ালা স্বয়ং পূরণ করিয়া দেন। তাঁহার ওয়াদা এই যে, তোমাদের পক্ষে যতটুকুই চেষ্টা করা সম্ভব তাহা নিশ্চয়ই কর, তারপর বাকীটুকু আমি পূর্ণ করিব এবং সমস্ত সওয়াব তোমাদের অধিকার বা উপযুক্ততা ব্যতিরেকেই তোমাদিগকে দান করিব। সমগ্র জগতের জন্য এবং প্রত্যেক দেশের জন্য আমাদের দোওয়াও করা উচিত এবং আমাদের এই দেশের (পাকিস্তান) জন্যও খাসভাবে দোওয়া করা উচিত, আল্লাহতায়ালা যেন ইহাকে সংহতি ও মজবুতী দান করেন, এখানেও যেন ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং ইসলাম যে প্রকারের সর্বাঙ্গীণ সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গঠন করিতে চায়, তাহা আমাদের দেশে গড়িয়া উঠে। খোদা করুন তাহাই যেন হয়। (আমিন)

(আল-ফজল, ১৪ই অক্টোবর ১৯৭৮ ইং)

(২)

রাবওয়া (মসজিদে আকসা), ২৭ই ঈখা (২৭ই অক্টোবর)—তাশাহুদ ও তায়াউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর সৈয়দনা হযরত খালিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) সুরা আল হুজরাতের ১৬ হইতে ১৮ নং আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন। আয়াততুয়ের তরজমা :—"কেবল তাহারাই মুমেন যাহারা আল্লাহ এবং তাহার রসুলের উপর ঈমান আনিয়াছে, তারপর তাহারা সন্দিগ্ধ ও সংশয়াকুল হয় নাই এবং যাহারা আল্লাহর পথে তাহাদের জান ও মাল দ্বারা জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) করে, এক মাত্র তাহারাই সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান। বলিয়া দাও যে, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম শিখাইবে ?! অথচ আল্লাহই আকাশমালা ও পৃথিবী মধ্যস্থ সবকিছু জানেন এবং প্রতিটি বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত। তাহারা মুসলমান হইয়াছে বলিয়া তোমার উপর তাহাদের অনুগ্রহের দাবী জানায়। বলিয়া দাও যে, তোমাদের ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আমার উপর কোন রূপ অনুগ্রহের দাবী জানাইও না, বরং আল্লাহতায়ালারই তোমাদের উপর অনুগ্রহ যে তিনি তোমাদিগকে ঈমানের দিকে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।"

উক্ত আয়াতসমূহের হৃদয়গ্রাহী সুক্ষ্মতত্বপুর্ণ তফসীর বর্ণনা করিয়া হুজুর (আইঃ) জামাতের বন্ধুদিগকে প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী প্রসঙ্গে দুইটি মৌলিকতত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :—

প্রথম এই যে, اتعلمون الله بدينكم ('তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম শিখাইবে') —আয়াতাংশ অনুযায়ী কেহ মুমেন কিনা ইহার প্রকৃত জ্ঞান রাখেন, একমাত্র আল্লামুল গুয়ুব" আল্লাহতায়ালাই, এতদ্ব্যতীত যে আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তাঁহার কোন মনোনীত বান্দাকে সে সম্পর্কে জ্ঞাত করেন। সেইজন্য খোদা ছাড়া কেহই অন্যের দ্বান ও ঈমান সম্বন্ধে ফয়সালা দিতে পারে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে. প্রত্যেকের উচিত সে যেন খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ এবং তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিয়া এবং আল্লাহর পথে স্বীয় প্রাণ (সর্বাত্মক দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যয় ও কর্ম-প্রয়াস) এবং ধন-সম্পদের দ্বারা চরম পর্যায়ে মুজাহিদা বা প্রচেষ্টা চালাইয়া لم يرتابوا ('তাহারা সন্দিগ্ধ ও সংশয়াকুল হয় নাই')-এর মোকাম ও পদমর্যাদা লাভ করে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রসুল (সাঃ)-এর উপর সন্দেহাতীতরূপে আন্তরিকভাবে ঈমান আনার পর শয়তানী ওসওসা ও কুপ্ররোচনার এরূপ সাভল্যজনক মোকাবিলা করে, যে স্বয়ং তাহার নিজের ঈমান সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়।

হুজুর বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, এই মোকাম ও পদমর্যাদা লাভের পথে একটি অপরিহার্য চাহিদা বা দাবী এই যে, উল্লেখিত ব্যক্তি যেন অপর প্রতিটি মানুষের নিন্দা ও ভর্ৎসনার প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া খোদাতায়ালার দেওয়া মা'রেফত ও জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী আল্লাহ ও রসুলের উপর স্বীয় ঈমান ও বিশ্বাসকে প্রকাশ করে ও উহার ঘোষণা করিতে থাকে এবং এ ব্যাপারে বিন্দু মাত্রও দ্বিধাবোধ না করে।

হুজুর (আইঃ) এ বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহতায়ালা—قل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين আয়াত অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে প্রেরণ করিয়া আল্লাহতায়ালার সূক্ষাতিসূক্ষ্ম স্বত্তা ও তাঁহার অনন্ত সিফাত বা গুণাবলী ও তাঁহার অপরিসীম কুদরত বা শক্তিনিচয়, তেমনি ধারায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব, মানবীয় মেধা-বুদ্ধিরও উর্ধে তাঁহার নজিরবিহীন 'হুস্‌ন ও ইহসান'—সৌন্দর্য ও কল্যাণ' এবং কেয়ামতকাল ব্যাপী অব্যাহত তাঁহার ফয়েজ ও কল্যাণ সম্পর্কীয় মা'রেফত ও তত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন এবং আমরা সন্দেহাতীত জ্ঞানের ভিত্তিতে আন্তরিকভাবে এই যাবতীয় বিষয়ের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা উহা প্রকাশ ও ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারি না। অন্যেরা আমাদের সম্বন্ধে যাহা খুশী বলুক বা মনে করুক উহা তাহাদের অভিরুচী, আমরা আমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ ও সন্দেহাতীত জ্ঞান ভিত্তিক ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের বরখেলাপ কোন কিছুই স্বীকার করিতে পারি না, এবং এজন্য পারিনা যে, ইহজগতে আমরা শুধুমাত্র একটি বিষয়েই চিন্তান্বিত থাকি। এবং তাহা হইল এই যে, আমাদের খোদা যেন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। আমরা না তো খোদা তায়ালাকে পরিত্যাগ করিতে পারি. না হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে ছাড়িতে পারি। পরন্তু প্রত্যেক আহমদীই আল্লাহতায়ালার দেওয়া শক্তি ও সামর্থে চেষ্টিত থাকিবে যেন আল্লাহতায়ালার অদ্বিতীয় স্বত্তা ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বোচ্চ মোকাম ও মর্যাদার যে জ্ঞান ও মা'রেফত এবং সকল প্রাকারের সন্দেহ ও সংশয়ের মোকাবিলা করার যে শক্তি তাহাকে দান করা হইয়াছে উহাতে যেন বিন্দুমাত্র অভাব ও ত্রুটির সৃষ্টি না হইতে পারে। (আল-ফজল ২৮শে অক্টোবর ১৯৭৮ ইং)

অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৬তম সালানা জলসা ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর খোদতায়ালার বিশেষ ফজলে সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। জলসার দু'দিনের তিনটি অধিবেশনে বাংলাদেশের জামাত আহমদীয়ার প্রখ্যাত বক্তাগণ বর্তমান যুগে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও আদর্শ, এবং বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়নের উপায় ইত্যাদির উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

প্রথম দিনের অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব আলী আজগর খাঁ ও জনাব হাবিবুল্লাহ। তারপর জলসার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম জনাব আমীর সাহেব। শ্রুতি মধুর ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর যথাক্রমে সাদাকাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), মৌঃ ছলিম উল্লাহ সাহেব, ত্রিত্ববাদ ও তৌহিদ আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, ওফাতে ঈসা (আঃ) খন্দকার ছালাহ উদ্দীন সাহেব, তালিমে কুরআন ও ওয়াকফে আরজী শহীদুর রহমান সাহেব, জিকরে হাবিব (আঃ) মৌঃ গোলাম আহমদ খাব সাহেব বক্তব্য পেশ করেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর একামাতে সালাত, খেলাফত ও এতায়াতে নেজাম, সন্তানদের তরবিয়ত ও মাতা-পিতার দায়িত্ব, মালী কুরবানী, কুরআন করীমের মাহাত্ম ও সৌন্দর্য্য বিষয়ের উপর প্রাঞ্জল ভাষায় সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন যথাক্রমে প্রফেসার আব্দুল লতিফ খান সাহেব, আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, ওবায়দুর রহমান ভুঞা সাহেব, রেজাউল করীম সাহেব ও মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী।

জলসার শেষ অধিবেশণ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সিরাতে রসুল আকরাম (সাঃ), খতমে নবুয়ত, আহমদীয়াতের ইতিহাস, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও জামাতে আহমদীয়া বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন যথাক্রমে জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, প্রফেসার আমীর হোসেন সাহেব, নুরুদ্দীন আহমদ সাহেব এবং বি, এম, সাত্তার সাহেব।

পরিশেষে জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ছালাহ উদ্দীন চৌধুরী জলসায় যোগদানকারীদের প্রতি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বক্তব্য রাখেন। মোহতারম জনাব আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ এবং দেওয়ার পর জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রায় ৩৪টি জামাত থেকে ৭ শতজন আহমদী ভ্রাতা ও ভগনী জলাসায় যোগদান করেন।

এই জলসার সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও সুফলের জন্য সকলের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

(প্রেসিডেন্ট, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া)

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ার ফজলে বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লার ৩য় বার্ষিক ইজতেমা ১০ ও ১১ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ইং তারিখে অতি সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা, তেজগাঁ, নারায়ণগঞ্জ ময়মনসিংহ, বিরপাইকশা, কোটিয়াদি, সিলেট, আহমদনগর (দিনাজপুর) ইত্যাদি জামাত হইতে শতাধিক আনসারুল্লাহ ইজতেমায় যোগদান করেন। বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার মোহতারম আমির সাহেব সারগর্ভ ও ঈমানউদ্দীপক উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। তাগাজ্জুদের বাজামাত নামাজ, দরসে কুরআন, দরসে হাদিস ও দরসে মলফুজাত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ছাড়া মোকামে খেলাফত, সীরাতে রসুল (সাঃ), তরবিয়তে আওলাদ, আনসারুল্লাহর উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব, বিবাহ ও জীবন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জামাতের মুরুব্বী ও বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা সমূহ প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রদান করেন সর্বজনাব ওয়াইজুর রহমান ভূঞা, নাজেম আলা, আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক, মকবুল আহমদ খান, শহিদুর রহমান, আনওয়ার আলী, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী এবং আরো অনেকে। পরামর্শ-সভায় তরবিয়ত, বিবাহ-শাদী ও আনসারুল্লাহ সংগঠনের উন্নত সাধন বিষয়ে সকল আনসার প্রতিনিধি, গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা করেন। প্রশ্ন-উত্তর সভায় আকর্ষণীয় সারগর্ভ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

শরীরচর্চা স্বরূপ আনসার ও খোদ্দামের মধ্যে ভলিবল খেলাও অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যা প্রায় ৮টার সময় ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই পবিত্র ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ওকফে-জদীদের চাঁদা আদায়ে তৎপর হউন

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) বলেন :

"আমাদের এরূপ মুখলেস আহমদী মুয়াল্লেমের প্রয়োজন যাঁহাদের অন্তরে কুরআনী আহকামের উপর নিজেরা আমল করার এবং অন্যকেও আমল করাইবার আগ্রহ-উদ্দীপনা আছে। তারপর সেই সকল মুয়াল্লেমের খরচ-পত্র পূরণের উদ্দেশ্যে আমাদের চাঁদাও দেওয়া উচিত। এই চাঁদার এক অংশ আমি আহমদী বালক-বালিকাগণের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে তাহাদের জিম্মায় ন্যাস্ত করিয়াছিলাম। আমি চাই, যে স্বপ্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছাকৃতরূপে নিজের পকেট খরচ হইতে অল্প কিছু টাকা বাঁচাইয়া এই তাহরীকে পেশ না করে। এমন কোনও আহমদী বালক-বালিকা যেন না থাকে।" (১৪ই জানুয়ারী ১৯৭৮ইং তারিখের জুমার খোৎবার সারাংশ)

ওকফে জদীদের চলতি বৎসর ৩১শে ডিসেম্বরে শেষ হইতে চলিয়াছে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি তদনুযায়ী নিজেদের এবং সন্তান-সন্ততিদের ওকফেজদীদ চাঁদা পরিশোধ করিয়া প্রতিশ্রুত গালবায়ে-ইসলামের আসমানী পরিকল্পনার বাস্তবায়নে অংশীদার হউন। আল্লাহতায়ালা আমাদের প্রত্যেকের সহায়ক ও রক্ষক হউন। আমীন। এই চাঁদার নূনতম হার বার্ষিক ১২ টাকা।

রাবওয়া ও কাদিয়ানে সালানা জলসা এবং দোওয়ার আবেদন

১৮, ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর এবং ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ ইং তারিখে যথাক্রমে কাদিয়ান এবং রাবওয়ায় জামাত আহমদীয়ার ৮৭ ও ৮৬তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হইতেছে। উভয় জলসার সার্বিক সফলতা এবং জলসায় যোগদাকারীদের নিরাপত্তা মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন। বাংলাদেশ হইতে এবার দুইজন ভ্রাতা কাদিয়ান জলসায় যোগদান করিতেছেন। তাঁহারা হইলেন কাজী আনওয়ারুল হক এবং বশীরুদ্দিন আফজাল আহমদ খান চৌধুরী।

রাবওয়ার জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে যাঁরা যাইতেছেন তাঁরা হইলেন মোহতারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী; মৌঃ গোলাম আহমদ খান সাহেব, প্রেসিডেন্ট চিটাগাং জামাত, জনাব আতা ইলাহী সাহেব, মিসেস মোখতার বানো, মিসেস নাসিরা বেগম। আরও কয়েকজন ভ্রাতা ও ভগ্নি পাসপোর্ট ও ভিসার জন্য চেষ্টিত আছেন। সকলের জন্য দোওয়ার বিশেষভাবে আবেদন করা যাইতেছে।

পবিত্র হজ্ব-পালন

আল-হাজ্ব মৌঃ আব্দুস সালাম সাহেব ও বেগম মুসলেমা সালাম সাহেবা আল্লাহর ফজলে বয়তুল্লাহ শরীফের পবিত্র হজ্ব এবং মদিনা শরীফের যিয়ারত লাভের পর ৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলমত লণ্ডনে ফিরিয়া যান। সেখানে তাঁহারা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আরও কিছু দিন অবস্থান করিবেন। তাঁহাদের পুর্ণ আরোগ্য এবং মঙ্গলমত দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

সংকলন—আহমদ সাদেক মাহমুদ

শোক সংবাদ

নারায়ণগঞ্জ জামাতের জনাব বদর উদ্দিন আহমদ সাহেবের মাতা তাহেরুন নেছা সাহেবা বিগত ৩/১২/৭৮ইং তারিখে রবিবার দুপুর ২-৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না .... রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০০ বছর। তিনি বেশ কিছুকাল ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ৪ ছেলে ও এক মেয়ে এবং অনেক আত্মীয় স্বজন ও নাতি নাতনী রেখে গেছেন।

মরহুমা অত্যন্ত মোখলেস, ধর্মপ্রাণ ও সদালাপী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদ নামাজ ও রোজা রাখিতেন।

মরহুমার নামাজ জানাযা স্থানীয় পাইকপাড়া কবরস্থানে পড়া হয় সেখানেই। তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। মরহুমার আত্মার মাগফেরাত এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ দোওয়া করবেন।

খাকছার—
—মিসেস বদর উদ্দিন

কায়রো বিতর্ক ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

(পূর্ব প্রকাশের পর)

—হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী (রাঃ)

ইতিপূর্বে যে দশটি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তাতে সরাসরি নাকচ হয়ে গেছে যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর বিশ্বাসটা। ক্রুশের আসল প্রমানটা হলো—ইহুদীরা যীশুকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। তাঁকে সোপর্দ করা হয়েছিল রোমান আদালতে। তাঁর নির্দোষত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছিলেন গভর্নর পীলাত। কিন্তু উপরওয়ালার উপরে প্রতিপত্তি ও প্রভাব ছিল ইহুদীদের। তারা চীৎকার করেছিল :

"কিন্তু ইহুদীরা চেঁচাইয়া বলিল, আপনি যদি উহাকে ছাড়িয়া দেন, তবে আপনি কৈসরের (সীজার) মিত্র নহেন, যে নিজেকেই রাজা বানাইয়া তুলে সে কৈসরের বিপক্ষে কথা বলে।" (যোহন ১৯ : ১২)

পীলাত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। অবশেষে ইহুদীদের ইচ্ছার কাছে নতী স্বীকার করে তিনি যীশুকে ক্রুশবিদ্ধকরণের জন্য সোপর্দ করলেন। কিন্তু তবু বললেন :

"এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ। তোমরাই তাহা বুঝিবে।" (মথি—২৭ : ২৪

পীলাত তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে চেয়েছিলেন যীশুকে খালাস দিতে। তাই তিনি আড়ালে অন্যভাবে কাজ করলেন। ক্রুশবিদ্ধকরণের জন্য দিন ধার্য করলেন শুক্রবার। পরদিন ছিল একটি বিশেষ সাব্বাথ দিবস, যেজন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল ইহুদীদের। তারপর, তিনি ক্রুশবিদ্ধকরণ কার্যকর করার ব্যাপারেও বিকেল পর্যন্ত বিলম্ব ঘটালেন। ফলে টাঙ্গিয়ে রাখার জন্য সময় পাওয়া গেল মাত্র তিন ঘণ্টা। এই স্বল্প সময়ে সেই প্রাচীন কালের ক্রুশে একটা লোককে লটকিয়ে রেখে মেরে ফেলা কিছুতেই সম্ভবপর ছিল না। ডঃ ডার্মণ্ড রবিনসন নামক ইউরোপের একজন প্রখ্যাত ডক্টর লিখেছেন : "ক্রুশবিদ্ধ একজন মানুষের মারা যেতে সময় লাগে, সাধারণ নিয়মে, ২৪ থেকে ২৮ ঘণ্টা।" (ডন, মে ১৬, ১৯২৭/ 'দি কমেণ্টারি অব জন', পৃঃ ৭৮৫, কায়রোতে ছাপানো।) সূর্যাস্তের পর কোনো ক্রুশবিদ্ধ মানুষকে ক্রুশে টাঙ্গান অবস্থায় রাখতে নিষেধ করা আছে ইহুদী আইনে। ইহুদীরা যীশুকে ক্রুশ থেকে অপসারিত করার জন্য অনুমতি চেয়েছিল, এবং তাঁকে ক্রুশ থেকে নামানো হয়েছিল। পীলাতের লোকজন যীশুর হাড়ও ভাঙ্গে নি, যদিও একই সঙ্গে ক্রুশেবিদ্ধ দুইটি চোরের হাড় ভেঙ্গে দিয়ে তাদের মৃত্যুকে নিশ্চিত করা হয়েছিল। তারা তাকেও মৃত বলেই ঘোষণা করেছিল। পক্ষান্তরে পীলাতের সংগে শলা-পরামর্শ করা ছিল। যোসেফ অরিমাথিয়া যীশুর একজন গোপন শিষ্য। পীলাত তাকে ডেকে যীশুকে তার হাতেই তুলে দিলেন। নিকোদীনের সাহায্যে যোসেফ অরিমাথিয়া যীশুর দেহের ক্ষত স্থানগুলিতে ঔষধপত্র ও মলম-অনুপান লাগালেন, ফলে যীশু সুস্থ হয়ে উঠলেন। যে মলম বা ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছিল তাঁর চিকিৎসার জন্যে, প্রাচীনকালের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুঁথি-পুস্তকে

তার উল্লেখ পাওয়া যায় 'মরহুমে ঈসা' (যীশুর মলম) বলে। পীলাত শেষ পর্যন্ত এমনভাবে তার 'হাত ছাফ রাখতে' পেরেছিলেন যে, একদিকে যীশু বেঁচে গেলেন, অন্যদিকে ইহুদীরাও তাঁর বিরুদ্ধে সীজারের কাছে কোনো নালিশ করার মওকা পেল না। পরিবর্তে ইহুদীরা প্রচার করে বেড়াতে লাগলো যে, তাঁরা যীশুকে হত্যা করেন, এবং তাঁর নবী হওয়ার দাবীকে ঝুটা প্রমাণিত করেছে। যীশুর শিষ্য-শাগরেদরা তো আগেই পালিয়ে বেঁচেছিল। তাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না ইহুদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার। তারাও ঈহুদীদের কথাই মেনে নিল এবং এটাই সাব্যস্ত করলো যে হাঁ, যীশুকে তো কতল করা হয়েছে এবং ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু, তিনি মৃত থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং এখনও বেঁচে আছেন। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য এবং যীশু যে ধরা-পৃষ্ঠেই বেঁচে আছেন তা প্রমাণ করতে অসমর্থ হয়ে, তারা বলে বেড়াতে লাগলো যে, যীশু আসমানে চলে গেছেন। এই করে তারা নিষ্পাপ যীশুর উপরে খোদার লানত বা অভিশাপ চাপিয়ে দিল। এটা তারা করেছিল তাদের দুর্বলতা এবং তাদের আহাম্মকীর জন্যই।

অবশ্য এটাও সম্ভব যে, ইহুদীদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে রাখার জন্যই চালাকি করে বলা হয়েছিল যে যীশু আসমানে চলে গেছেন। কিন্তু এটাই শেষ পর্যন্ত একটা বিশ্বাস হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থার মধ্যেই নিপতিত ছিল ইহুদী ও খৃষ্টানরা, পাবিত্র আত্মাসহকারে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত। তিনি অজ্ঞতার কুয়াশারাশিকে অপসারিত করলেন অহী বা ঐশীবাণীর আলোকে। তিনি যীশুকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের লানত থেকে মুক্ত করার জন্য দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

"এবং তাহারা বলে, আমরা মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহর রসুলকে কাটিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে কাটিতে পারে নাই, ক্রুশেও টাঙ্গাতে পারে নাই। অবশ্য তাহাদের নিকটে তাঁহাকে অনুরূপ (ক্রুশে মৃতের অনুরূপ) করা গিয়াছিল এবং যাহারা এ ব্যাপারে মতানৈক্য করে, তাহারা নিশ্চয়ই আন্দাজের মধ্যে নিপতিত। এ ব্যাপারে তাহাদের কোনও নিশ্চিত জ্ঞান নাই ; তাহারা শুধু আঁচ-আন্দাজকেই আঁকড়াইয়া থাকে। এবং তাহারা এ ব্যাপারে কখনই নিশ্চয়তার মধ্যে উপনীত হয় নাই। বরং আল্লাহ তাঁহাকে উন্নীত করিয়াছেন তাঁহার দিকে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, সর্বজ্ঞ।"

(আল-কোরআন—৪ : ১৫৮ - ১৫৯)

আল-কুরআনের এই কথাই প্রতিষ্ঠিত সত্য—খৃষ্টানদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। যুক্তিগ্রাহ্য এবং দলীল—প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত ইহাই। এতে যীশুর মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে এবং ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিও পূর্ণ হয়। আমাদের আশেপাশে বেহুঁশ হওয়ার ও চিৎ-পাটাং হয়ে পড়ে থাকার এমন বহু ঘটনাই হরহামেশা ঘটছে যেগুলিকে আমরা মরা বলেই ধরে নেই। বাইবেলের একটা ঘটনার কথা শুনুন : "কিন্তু আন্তিয়খ ও ইকনিয়া হইতে কয়েকজন ইহুদী আসিল ; আর তাহারা লোকদেরকে প্ররোচনা দিয়া পৌলকে পাথর মারিল, এবং নগরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল, মনে করিল, তিনি মরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শিষ্যগণ তাঁহার চারি পার্শ্বে দাঁড় হইলে তিনি উঠিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।" (প্রেরিত-১৪ : ১৯ ২০)

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ

এককালে যারা কৃষ্ণসাগর আর ককেশাস মধ্যবর্তী প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল; কিছুকাল আগ পর্যন্ত যারা দ্বীপপুঞ্জে এবং গির্জার চারদেয়ালের চত্বরেই আবদ্ধ ছিল; আর এককালে যারা চারদেয়ালের সীমানা টপকে বেরিয়ে পড়েছে সাগরে-নগরে, পাতালে-নভোমণ্ডলে এবং আর কিছুকাল পরে যারা অতি প্রকৃত ইসলামের সীসাগালিত প্রাচীর সমক্ষে উদ্ধত শির অবনত করবে, কোরআন শরীফে তাদের ইয়াজুজ ও মাজুজ এবং হাদীস শরীফে তাদেরই দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এরা কারা, তা আরো খোলাখুলি ভাবে জানবার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে যে, কেন আমরা এ দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজ প্রসংগ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবো। এজন্যই করবো যে, সুরা কাহ্‌ফে আল্লাহতায়ালার সতর্কবাণী রয়েছে—"ইন্না ইয়াজুজ ওয়া মাজুজা মুফসেদুনা ফিল আরজে"-নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করবে।" ইয়াজুজ ও মাজুজের এ অশান্তির ছোঁবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই এদের সম্পর্কে ভাবা চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। আরও একটি বিশেষ কারণ রয়েছে—সেটি হ'ল, ইসলামের পতনের যুগ কোনটি, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাবই তা চিহ্নিত করবে। ইসলামের পতন মানে চূড়ান্ত পতন ও নিশ্চিহ্ন হওয়া নয়। বরং যে যুগে ইসলাম ধর্ম পতনোন্মুখ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে, সে যুগে ইসলাম ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে। ইসলামের সেই পতনোন্মুখ যুগে সমগ্র মানব জাতির বিশেষ করে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হবে সেই ইমাম মাহদীর হাতে বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণ করা। এজন্য প্রয়োজন রয়েছে, দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ইসলামের পতনের যুগ তথা ইসলামী পরিভাষায় আখেরী যামানার লক্ষণাবলীর মধ্যে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব একটি অন্যতম লক্ষণ। ইসলামী কেলেণ্ডারে ১৩ শতাব্দী হিজরীর শেষে অথবা ১৪ শতাব্দী হিজরীর প্রারম্ভে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব কুরআন, হাদিস ও কাশ্‌ফ ও এলহাম মূলে তেরশত বৎসর ব্যাপী সকল বুজুর্গান ও উলমা রাব্বানীর সর্ব সম্মত অভিমত বা একটি ধ্রুব সত্য। সুতরাং উল্লেখিত যুগে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

এবার আপনারা যুক্তিসংঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করিতে পারেন, তাহলে আখেরী জামানার ইমাম মাহদী কোথায় এবং ইমাম মাহদীর আগমণ কালে যে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ এর আবির্ভাব ঘটবে, সেই দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের অস্তিত্বই বা কোথায়? এখন আমরা ইসলামসম্মত যুক্তি প্রয়োগ করে যদি প্রমাণ করতে পারি যে বহু দিন আগেই নির্ধারিত সময়ে দাজ্জাল ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হয়েছে, তা হলে তার দ্বারা এটাও

কি প্রমাণিত হয়না যে, ইতিমধ্যে ইমাম মাহদীরও আবির্ভাব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব প্রমাণিত হবার সাথে সাথে নীরবে ইমাম মাহদীর আগমণের সত্যতাও প্রমাণিত হতে থাকবে এবং একই সাথে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে স্বীকার করে নেয়ারও নীরব আহ্বান থাকবে।

দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ আপনার আমার, সবার চারিপাশে ঘোরাফেরা করছে। কুরআন শরীফে যাদের ইয়াজুজ মাজুজ বলা হয়েছে, হাদীস শরীফে তাদেরই দাজ্জাল বলা হয়েছে অর্থাৎ দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের দুটি পৃথক পৃথক স্বত্তা নয়. একটি বিশেষ স্বত্তার দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নাম। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ) দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের অশান্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, এক কথায় তাদের পরিচয় জানার জন্যে সুরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত এবং শেষাংশ পাঠ করতে বলেছেন। (বোখারী) সুরা কাহফের প্রথমে ও শেষাংশে খ্রীষ্টান জাতি এবং তাদের পার্থিব উন্নতি ও ইসলামের বিরোধিতার কথা বলা হয়েছে। সুরা কাহফের পঞ্চম আয়াতে আল্লাহতায়ালা স্পষ্ট ভাবে বলেছেন: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا "ইযুনজেরাল্লাজিন কালুত্তাখাজাল্লাহু ওয়ালাদান"- "কোরআন তাদের সতর্ক করে, যারা বলে আল্লাহ পুত্র গ্রহণ করেছেন।" তারা হ'ল খৃষ্টান জাতি। কাজেই দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয় জানার জন্যে যে সুরা কাহফ পাঠ করতে বলা হয়েছে, সেই সুরা কাহফ পাঠ করলে আমরা দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ বলতে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান জাতিরই পরিচয় পাচ্ছি। তা'হলে আধুনিককালের পার্থিব ঐশ্বর্যের অধিকারী ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান জাতিই কি দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ বলে চিহ্নিত হয় না?

আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছেন, মানুষ কি করে দাজ্জাল হয়? কিন্তু কি কারা যাবে? আমরাতো কুরআন পাঠ করেই দেখতে পাচ্ছি, আসলে একদল মানুষই দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ। আর দাজ্জাল কোন আজগুবি জানোয়ারও হ'তে পারে না। কারণ হাদীস শরীফে আছে, দাজ্জালের গাধা থাকবে এবং তার খাদ্য হ'বে জলন্ত আগুণ আর পানি। কিন্তু গাধা নামক চতুষ্পদ জন্তুটি আর যাই খাক, অন্ততঃ সে জলন্ত আগুন খায় না, একথা সবাই জানেন। এ কেমন গাধা, যার খাবার হবে জলন্ত আগুন। এ গাধা সম্বন্ধে হাদিসে আরো বলা হয়েছে যে, উহার মাথায় চন্দ্রের মত আলোক থাকবে এবং মানুষ উহার পেটের ভিতরে বসে দ্রুত ও দূরদূরান্তে যাতায়াত করবে। এটি এমন গাধা যা চতুষ্পদ গাধার মতোই বোঝা বহণ করে কিন্তু পিঠে নয় পেটে অর্থাৎ উহা একটি ভিতরে বসার ব্যবস্থাসম্পন্ন বাহন। আধুনিক যুগে সফর এবং পরিবহণের কাজ যার দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে: ট্রেন, ট্রাম, মটর গাড়ী এবং অন্যান্য যন্ত্রচালিত যানবাহন। আর এসব বাহনের শক্তি উৎপাদক অর্থাৎ খাবার হচ্ছে আগুন-পানি। এবং এগুলোর আবিষ্কারকও হলেন পশ্চিমা নাস্তিক ও খৃষ্টান বৈজ্ঞানিক বৃন্দ। সে অর্থে যেহেতু এ সব যান বাহন দাজ্জালেরই গাধা এবং আবিস্কারের দিক থেকে যেহেতু এগুলো পশ্চিমা নাস্তিক ও খৃষ্টান জাতিরই গাধা বা বাহন, সেহেতু পশ্চিমা নাস্তিক ও খৃষ্টান জাতি পরিস্কারভাবে দাজ্জাল বলে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে আগুন পানি ভক্ষণকারী

গাধা বলতে অলিক কল্পনা প্রসূত রক্তমাংসের কোন গাধাকে না বুঝিয়ে গুণগত অর্থে যেমন আজকালকার স্বাভাবিক যানবাহন গুলোকেই বুঝিয়েছে, তেমনি দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ বলতে কোন কিংবদন্তির প্রাণীকে না বুঝিয়ে কি গুণগত অর্থে খৃষ্টান জাতিকে বোঝাতে পারে না ? দাজজাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ এর যে সব বৈশিষ্ট্য থাকার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, খৃষ্টান জাতির মধ্যে তার সব ক'টি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।

দাজ্জাল শব্দের শাব্দিক অর্থ বৃহৎ দল এবং যারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক। নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, খৃষ্টান জাতি আজকের বিশ্বের সবচাইতে বৃহৎ দল এবং হযরত ঈসাকে আল্লাহর যাত পুত্র হিসাবে বিশ্বাস করা এবং প্রচার করাকে সুরা কাহফে সর্বাপেক্ষ মিথ্যা বলেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে যথা—"ইন ইয়াকুলুনা ইল্লা কাজেবা" দাজ্জালের আরো একটি শব্দগত অর্থ হল, পণ্যদ্রব্য বহণকারী। পণ্যদ্রব্য তথা বাণিজ্যের মাধ্যমেই এ জাতিবর্গ বিশেষতঃ দ্বীপপুঞ্জের ইংরাজ জাতি সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে।

ইয়াজুজ ও মাজুজ এর শব্দগত বুৎপত্তি হচ্ছে 'আজ' অর্থাৎ আগুন। আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, আগুনকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কল-কারখানা এবং আগ্নেয়াস্ত্র যেমন—এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, ইত্যাদির বস্ফোরণের প্রতিযোগিতায় কারা মত্ত ? এসব ক্রিয়া-কাণ্ডের ধারক ও বাহক যারা, ইয়াজুজ-মাজুজ তারাই। আমরা দেখছি, পুঁজিবাদী মার্কিন খৃষ্টান জাতি আর সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী রাশিয়া সমেত নাস্তিকবাদীরা এসব কারসাজিতে লিপ্ত। অতএব এরাই ইয়াজুজ-মাজুজ

পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির গোড়ায় রয়েছে দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ। দু'টো পন্থা অবলম্বন করে এরা অশান্তির সৃষ্টি করছে। প্রথমতঃ মিথ্যা ধর্মপ্রচারণা চালিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ আগ্নেয়াস্ত্রের প্রভূত্ব ও ছড়াছড়ির মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সংঘটন এবং অশান্তি ও যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দাজ্জাল বলতে তাদের এ ধর্মিয় অপকীর্তি আর ইয়াজুজ ও মাজুজ বলতে তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপকেই বুঝায়। সুতরাং দাজ্জাল হ'ল ধর্মীয় নাম, যদ্বারা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী জাতি বিশেষ করে পাদ্রী সম্প্রদায়কে বুঝায়। এরা একদিকে তিনখোদার উপাসনা করে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্খলনকে গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে শান্তির ধর্ম ও মানবতার রক্ষাকবচ ইসলামের বিরুদ্ধে নানাভাবে অপপ্রচার ও অপপ্রয়াস চালিয়ে একটি ধ্বংসাত্মক এবং অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি করছে। আর ইয়াজুজ-মাজুজ হিসেবে খৃষ্টান এবং নাস্তিক্য বাদীরা পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতিকে করায়ত্ব করার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়ে, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা চালিয়ে জগতে, জাতিতে জাতিতে অশান্তি সৃষ্টি করছে অতএব দেখা যাচ্ছে, এই বিভ্রান্ত শক্তিটি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক, উভয় ক্ষেত্রে আধিপত্য অর্জনের জন্য পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে কাজ করে বলে ধর্মীয়ভাবে এদের দ জ্জাল এবং রাজনৈতিকভাবে এদের ইয়াজুজ মাজুজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হাদিস শরীফের বক্তব্য অনুসারে এই খৃষ্টান-জাতি প্রথমদিকে তাদের ধর্মমন্দির গীর্জার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল অর্থাৎ তারা যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধের কারণে দূরদেশে গিয়ে ধর্মপ্রচার করতে পারেনি। ধীরে ধীরে ইয়াজুজ-মাজুজ এর বৈজ্ঞানিক তথা যান্ত্রিক প্রগতির সদ্ব্যবহার করে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে আখেরী যামানায় বিশ্বব্যাপী বিকৃত খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রচারের কাজ সকল প্রকার লোভনীয় প্রবঞ্চনামূলক পন্থায়ও চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্যে বলতে হবে যে, আখেরী যামানাতেই প্রকৃতপক্ষে তাদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এ আবির্ভাবের দ্বারা তারা নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেছে বলেই, তাদেরকে দাজ্জাল বলে অভিহিত করা হয়েছে ইহাই তাদের দজ্জাল নামের অর্থগত স্বরূপ।

রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে যারা অশান্তির সৃষ্টি করবে সেই চক্রটি ইয়াজুজ মাজুজ এদের উদ্ভব, প্রতিপত্তি এবং পরিণতি সম্পর্কে বহুকাল আগে হিজিকেল নবীকে অবগত করানো হয়। Old Testament এ আছে, হিজকেল নবী বলেছেন:—

"আর সদাপ্রভুর এ বাক্য আমার নিকট উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য সন্তান, তুমি রোশের, মেশকের ও তুবলের অধ্যক্ষ মাগোগদেশীয় গোগের দিকে মুখ রাখ ও তাহার বিরুদ্ধে ভাববাণী বল। তুমি বল, প্রভু, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে গোগ, রোশের, মেশকের ও তুবলের অধ্যক্ষ, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষ এবং তোমাকে এদিক ওদিক ফিরাইব। আর তোমাকে ও তোমার সমস্ত সৈন্যকে, অশ্ব ও সজ্জা পরিহিত সমস্ত অশ্বারোহীকে, ঢাল ও ফলকধারী মহাসমাজকে, খড়গ হস্তে সমস্ত লোককে বাহিরে আনিব। পারশ্য, কুশ ও পূট তাহাদের সংগী হইবে। ইহারা সকলে ঢাল ও শিরোস্ত্রানধারী, তোগমের ও তাহার সকল সৈন্যদল, উত্তর দিকের প্রান্তবাসী তোগমের কুল ও তাহার সকল সৈন্যদল এই নানা মহাজাতি তোমার সংগী হইবে" হিজিকেল নবীর এ বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, রাশিয়া ও ইউরোপের জাতি বর্গই সত্যিকার অর্থে ইয়াজুজ-মাজুজ বা গগ-মেগগ। খোলাখোলিভাবে এদের চেনার জন্য হিজিকেল নবীর বর্ণনায় রুশ ও তৎসংলগ্ন সুপরিচিত এলাকার নাম প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ও ধ্বংসলীলার কথা বলা হয়েছে।

ইয়াজুজ ও মাজুজের আদী নিবাস শীত প্রধান অঞ্চল—মধ্য এশিয়া তুষার পাতের কারণে তাদের নিজস্ব এলাকায় শষ্যাদি আবাদ হতো না বলে ফসলের মৌসুমে তারা কাছাকাছি আবাদী অঞ্চল থেকে ফলিত ফসল লুণ্টন করে জীবিকা নির্বাহ করতো। এ'তে আবাদী এলাকার অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হ'য়ে দেশের সম্রাটের নিকট এর প্রতিকার চাইলো। সম্রাট শীত প্রধান দেশের লুণ্টনকারীদের আগমন পথে একটি দেওয়াল নির্মাণ করে প্রজাদের রক্ষা করলেন। কোরআন শরীফে এই প্রজাহিতৈষী সম্রাটকে 'জুলকারনাইন' বলা হয়েছে। আর ইতিহাস বলছে, এ জুলকারনাইন হ'লেন পারশিয় সম্রাট সাইরাস। সম্রাট সাইরাস কৃষ্ণ সাগর আর ককেশাস পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। আমাদের জানা আছে পারস্যের কাছাকাছি শীত প্রধান দেশ হচ্ছে রাশিয়া অর্থাৎ সাইরেসের সময়ে অনাবাদী রাশিয়ার কাছাকাছি আবাদি অঞ্চল ছিল পারশ্য। কাজেই বুঝা যায় রাশিয়ার

বাসিন্দারাই পারশ্য থেকে ফসল লুনটন করে নিত। এ'ছাড়া সম্রাট সাইরাস কৃষ্ণ সাগর এবং ককেশাস পাহাড়ের মধ্যবর্তী যে স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করেন ঐ স্থানটি ছিল রাশিয়া (মধ্য এশিয়া) থেকে পারশ্য যাতায়াতের একটি পথ। সুরা কাহফের শেষ রংশে বর্ণিত আছে, এমন একটি পথ দিয়েই ইয়াজুজ ও মাজুজ যাতায়াত করত সেখানে যুলকার নাইন দেয়াল তুলে ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মধ্য এশিয়া রাশিয়ার অধিবাসীরাই আদি ইয়াজুজ ও মাজুজ। ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্বন্ধে যেমন বলা হয়েছিল যে, তারা যান্ত্রিক উন্নতি সাধন করবে, তেমনি দেখা যাচ্ছে রাশিয়ার অধিবাসীদেরকেই দেখা যায় যান্ত্রিক উন্নতি সাধনের গোড়ায়, তার প্রমাণ রাশিয়ার অধিবাসী ইউরী গাগারিনই নভোযানের সাহায্যে সর্বপ্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন তিরমিযি শরীফে একটি হাদিস আছে যে, "ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের পর আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে।" উক্ত হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণীটি আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আকাশে রকেট নিক্ষেপ আজি যাদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে চলছে তারাই ইয়াজুজ মাজুজ

একসময় রাশিয়া থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজ যে লুন্টন কর্ম শুরু করেছিল, তারাই সাইরাস নির্মিত দেয়ালের কারণে মধ্য প্রাচ্যে না আসতে পেরে পরবর্তীতে ইউরোপে লুটতরাজ আরম্ভ করে এবং ঐ সকল দেশে স্থায়ীভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাহাদের বংশধরদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, ইয়াজুজ মাজুজ শেষ যুগে সারা জগতে আধিপত্য বিস্তার করবে এবং পরিশেষে তারা ধ্বংস হবে সুরা কাহফের শেষাংশে আছে: "ওয়াতারাকনা বাজাহুম ইয়াও মাইয়েজিন ইয়ামুজু ফি বাজেন" অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ শেষ যুগে তাদের অন্য শেষ কালে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আপাততঃ এরা স্নায়ুবিক যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। ঠাণ্ডালড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্নরূপে তাদের কারসাজি একটি অশুভ ভবিষ্যতেরই ইংগিত দিচ্ছে। কুরআন করীম, হাদিস ও বাইবেলের উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী পতন এদের অবশ্যম্ভাবী। এদের অবক্ষয় অনিবার্য।

আল্লাহতায়ালা ইমাম মাহদীকে জুলকার নাইন উপাধীতে ও ভূষিত করেছেন। এককালে যেমন সাইরাস নামীয় জুলকার নাইনের নির্মিত প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে ইয়াজুজ মাজুজ শক্তি রাশিয়া এবং ইউরোপের হিম প্রদেশে প্রবেশ করেছিল, একালেও তেমনি ইমাম মাহদী নামীয় জুলকার নাইনের কুরআনী তত্ত্বাবলীর আধ্যাত্মিক প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ চক্র মৃত্যুর হিম শীতল অতলে অথবা তৌবা ও অনুতাপ সাপক্ষে ইসলামের শান্তিময় ছায়াতে প্রবেশ করবে। সেদিন সমাগত প্রায়। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নে দেওয়া গেল:

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে না। কিন্তু একমবাদ্বিতীয় খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে।" (হাকিকাতুল ওহী—১৯০৬ ইং)

খোদাতায়ালার এই করুণা প্রাপ্তির জন্য অনুতাপের একটি মাত্র পথ ইমাম মাহদীকে গ্রহণ করে ইসলামের দীক্ষা নেওয়া আল্লার রসুল (সাঃ) বলেছেন, "ইমাম মাহদী আবির্ভূত হ'লে, যদি বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয় তথাপি তাঁর কাছে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করো। যদি আগুনের কুণ্ডলীর উপর দিয়ে যেতে হয়, তথাপি তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করো। যুগের ইমামকে না মেনে যে মৃত্যু বরণ করে সে জাহিলীয়তের মৃত্যু বরণ করবে।"

—জাফর আহমদ

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4. Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar